Barcode - 4990010202517
Title - Shantiniketan vol. 5
Subject - LITERATURE
Author - Tagore, Rabindranath
Language - bengali
Pages - 84
Publication Year - 1908
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 202517

শান্তিনিকেতন

(পঞ্চম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

নবযুগের উৎসব ১

ভাবুকতা ও পবিত্রতা ... ২৮

অন্তর বাহির ৩৫

তীর্থ ৪৪

বিভাগ ৫১

দ্রষ্টা ৫৯

নিত্যধাম ৬৩

পরিণয় ৬৭

শান্তিনিকেতন

নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি করছি, তার পরিণাম কি, তার তাৎপর্য্য কি সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানেনা যে, মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র;

সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্য্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, একথা শিশু অনেকদিন পর্য্যন্ত একেবারেই জানেনা। তবু একথা একদিন তাকে জান্‌তেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ কর্‌বার জন্যে পালন করচেনা—সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠ্‌চে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের ঊর্দ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আস্‌চি। আমরা কি কর্‌চি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জ্জন দেবেন, তাঁদের

ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন; মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত উৎস আছে তারি জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মত প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারিনে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়; এমন কি, এ'কে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও এ'কে ছোট করা হবে।

আমি বলচি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। একথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তাহলে চিত্তের সঙ্কোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত

হবেনা ; আমরা ঠিক জেনে যাবনা কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বল্‌ব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বল্‌বনা এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি ; যিনি সত্যম্‌ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখ্‌ব ; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ—
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন—আমি জ্যোতির্ম্ময় মহান্‌ পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল

আপনার মধ্যে গোপন করে রাখ্‌তে পারেনা। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর ত দরজা বন্ধ করে থাক্‌তে পারেন না; এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝ্‌খানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন, সে মূর্খই হোক্ আর পণ্ডিতই হোক্, সে রাজচক্রবর্ত্তী হোক্ আর দীন দরিদ্রই হোক্, অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যে দিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্ত্তা এসে পৌঁচেছিল, সে দিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জান্‌তেন, সে দিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃত-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সে দিন তিনি বলেছিলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"

যিনি সর্ব্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁকে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন; ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন—সে দিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, "বেদাহং", আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃত-

যজ্ঞে সর্ব্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে দিন তাঁর আমন্ত্রণ-ধ্বনি জগতের কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগ্‌ল—নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আস্‌তে থাকে তখন যেমন দেখ্‌তে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে ধারা দূর-দূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরে

সম্পাদ্ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসঙ্গীতের তানপুরার মত পর্ব্বত-শিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত নিরন্তর বাজ্‌তে থাক্‌ত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে—সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্ব্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলি কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ

সংস্রবকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্য্যালোক এবং বাতাসকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলি বিভাগ, কেবলি বাধা ;—বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়, —সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

"যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহাঃ"

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন স্বাহা !" কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চল্‌চে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনই হয় না। যে বল্‌তে পেরেছে "বেদাহং" আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বল্‌তেই হবে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখীর কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসঙ্গীতের সুর এসে পৌঁছিল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বল্লে „বেদাহমেতং"—আমি এঁকে জেনেছি! কাকে জেনেছ? "আদিত্য বর্ণং"—জ্যোতির্ম্ময়কে জেনেছি—যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতি-

র্ষ্য? কই তাঁকে ত আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখ্‌চিনে।—না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখোনি—তাঁকে দেখ্‌ছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েচ, সে যে অন্ধকার—নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না—সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্ম্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার; সেখানে দ্বারে একজন ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে, সে বল্‌চে, না, না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও! সে বল্‌চে কান বন্ধ কর, পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বস পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত "না" দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি

সেই অন্ধকারের কথা বলছিনে—কিন্তু বেদাহমেতং—আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের—যাঁকে জান্‌লে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না—যাঁকে জান্‌লে, নিম্ন দেশ যেমন জল সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাস সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে—তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জ্জন করে উঠল—দূর কর দূর কর, এ'কে বের করে দাও—এ'ত আমার ঘরের সামগ্রী নয়! এ'ত আমার নিয়মকে মান্‌বে না!

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেল্‌তে পারবে না—তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে!

প্রভাত এসেছে—আমাদের উৎসব এই কথা বলচে! আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্চে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব!

বহু যুগ পূর্ব্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল, "একমেবাদ্বিতীয়ং।" অদ্বিতীয় এক! পৃথিবীর এই পূর্ব্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন! একমেবাদ্বিতীয়ং! অদ্বিতীয় এক!

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে, যে, "একসূর্য্য উদয় হচ্চেন, এবার ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও"—এই মন্ত্র কোনো একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়

—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও—সমস্ত বিশ্বে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো—পূর্ব্বগগণের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং—আমি জান্‌তে পারচি—তমসঃ-পরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জান্‌তে পারচি—নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জান্‌তে পারে তেমনি করে—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ!"

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আস্‌চে সেই নব প্রভাতের বার্ত্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন

যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানব সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক! এক! এক! তিনি বল্‌ছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্‌ একের উপলব্ধি অভাবে—যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্ব্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে

প্রচার করতে—যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে!

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দ্দিনের মধ্যে কোথায় এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ং—দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠ্‌ল তখন এ কথা নিশ্চয় জান্‌তে হবে—সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

আমাদের দেশে আজ বিরাট্ মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নীচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর

গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে! এই খানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং!" বলে গিয়েছেন মনে রাখিস্, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক!

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিদ্রা নেই দেখচি! "এক" আমাদের স্পর্শ করেচেন, আর আমরা সুস্থির থাকতে পারচিনে! আজ আমরা ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি!

এ পথের পাথেয় আছে বলে জান্‌তুম না—এখন দেখ্‌ছি অভাব নেই! ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছিল!

তার পর থেকে আনাগোনা ত চলেইচে; একে একে দূত আস্‌চে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্চে যা পূর্ব্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মত স্ফীত হয়ে

উঠ্‌ছে। আমরা অনুভব করচি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনি খুল্‌বে এম্‌নি আমাদের মনে হচ্চে। কেননা কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে! আর ঐ যে দেখ্‌ছি বাতায়নে এক-একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্চেন! তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্চে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়; পৃথিবীতে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন;

তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না! তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সঙ্গীতকে এখনি বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুল্‌বেন। সেই মহাসঙ্গীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারম্বার ফিরিয়ে আন্‌তে হবে—একমেবাদ্বিতীয়ং!

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই! এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সাম্‌নে প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমা-

দের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলেনা যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা যারা বলে "একোবশী সর্ব্বভূতা-ন্তরাত্মা," সেই এক প্রভুই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ; আমরা তারা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা বলি "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ" হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায় ; আমরা তারা যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিনে আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং বর্ণাননেকান্নি-হিতার্থো দধাতি, সর্ব্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না ; আমরা তারা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক, এক, অদ্বিতীয় এক ! তবে আমরা আর এ স্থানীয় ধর্ম্ম এবং সাময়িক

লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাক্‌ব কেমন করে! আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখ্‌তে হবে। এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করচে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করচে সে ত এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি; যাকে বল্‌ব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের! না! আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিনি; আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন

করে আস্‌চি তা ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। “এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ” এই যে মহান্ আত্মা এই যে বিশ্বকর্ম্মা দেবতা যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্ত্তমান যুগে জগতে ধর্ম্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন; আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য!—এই আশ্চর্য্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করচি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে—বিধাতার এই মহতী কৃপার যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে! —বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, হৃদয়কে প্রসারিত কর, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনোনা, দুর্ব্বল বলে

যেনোনা—তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্ম্মকে যন্ত্রবৎ কোরোনা—সত্যকে সকলের ঊর্দ্ধে স্বীকার কর এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট-বিশ্বকর্ম্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম্ম রচনা করচ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি! তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্খানে স্পর্শ করেছে, সেখানে কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চল্‌চে তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝ্‌তে পারচিনে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে, আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচচেনা,

আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চেনা, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ কর্‌চে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়েচে; স্বার্থ আরাম, অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড় কিছুকেই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, এ কথা বলবার বল পাচ্চিনে যে সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্চে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে! হে পরমাত্মন্‌, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, আমাদের সচেতন কর; তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করচি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কি তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি। জগতে

তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানা-কালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই— ভয় দূর হোক্, অশ্রদ্ধা দূর হোক্, অহঙ্কার দূর হোক্, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত, এবং এক মঙ্গল-সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেনে সর্ব্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সঙ্কল্পকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা

করে বেরই ; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক্, হৃদয় বলতে থাক্ আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে-উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক্

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্যে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মত হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ অন্যান্য রসলাভের জন্য যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেই রকম নানাপ্রকার

আয়োজন করে। যাঁরা ভাল করে বল্‌তে পারেন সেই রকম লোক সংগ্রহ করে, রসোদ্রেক করবার জন্যে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবৎ রস নিয়মিত জোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এই রকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া বলে' ভুল করা মানুষের দুর্ব্বলতার একটা লক্ষণ। সংসারে নানা প্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্‌গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে' মানুষকে ভাই বল্‌তে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয়—এবং সেইরূপ ভাব অনুভব ও ভাব প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ঐখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলিনে। কিন্তু এ-কেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তাহলে

এই জিনিষটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ, এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে দু'টি পাবার পন্থা আছে।

গাছ দুরকম করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এক তার পল্লবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর এক তার শিকড় থেকে সে নিজের খাদ্য আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্চে, কখনো রৌদ্র উঠ্‌চে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্চে, কখনো বসন্তের হাওয়া বইচে—পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারি থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্চে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়চে—আবার নতুন পাতা উঠ্‌চে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিয়ত

স্তব্ধ হয়ে দৃঢ় হয়ে গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিয়ত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করচে।

আমাদেরও শিকড় এবং পল্লব এই দুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য এই দুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকেই নেওয়া হচ্চে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্চে চরিত্রের দিক্‌, এটা ভাবের দিক্ নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই, সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই—সেইখানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড় অলক্ষ্য বড় গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে কিন্তু ভাব-ব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না—সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা—সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলি গভীর থেকে গভীরতরে গিয়ে নাব্‌চে। সে শুদ্ধচারিণী স্নাত পবিত্র সেবিকার মত সকলের নীচে জোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে—দাঁড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কত পরিবর্ত্তন। আজ তার যে কথায় তৃপ্তি কাল তার তাতে বিতৃষ্ণা। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেল্‌চে—কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। গাছের পল্লবের মত তার বিকাশ আজ নূতন হয়ে উঠ্‌চে কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পল্লবিত চঞ্চল হৃদয় নবনব ভাব-সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না থাকে তাহলে এই সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও

বিনাশেরই কারণ হয়। যে গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে সূর্য্যের আলো তাকে শুকিয়ে ফেলে, বৃষ্টির জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তাহলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্ব্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই ;—সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়চে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের থেকে বর্ষিত হয় না—সেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জিনিষ, আর ভাবুকতা পল্লবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব— তোমার পায়ের ধুলো নিলুম—আমার ললাট নির্ম্মল হয়ে গেল—আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল—প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্ম্মে নির্ম্মল সতেজভাবে তার পরিচয় বহন করব।

২রা ফাল্গুন, ১৩১৫

অন্তর বাহির

আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্য, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদান প্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই সমস্ত প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, কত লীলা-খেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই।

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রেম-বশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উদ্যম প্রকাশ পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক

একই লোক নয়—অনেক সময় তার বিপরীতই দেখ্‌তে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে;—নানাপ্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উদ্যমকে আকর্ষণ করে নেয়। এই উদ্যমকে কোন্‌ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শান্ত করব সে কথা আর চিন্তা করতেই হয় না—লোক-লৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে দান করে' নিজেকে নিঃস্ব করে তা নয়—ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সম্বরণ করতে পারে না। নানা রকমের খরচ করে তার উদ্যম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুসি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে খরচ করে—সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয় কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তিবশত।

চর্চ্চা দ্বারা এই প্রবৃত্তি কিরকম অপরিমিত-রূপে বেড়ে উঠ্‌তে পারে তা য়ুরোপে যারা সমাজ-বিলাসী তাদের জীবন দেখ্‌লে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই—উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন—কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়-দৌড় এই নিয়ে তারা উন্মত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চল্‌চে না, কেবল দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরচে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদূর যাই নে কিন্তু

আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃদুতর ভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে খরচ করবার জন্যেই খরচ করে থাকি। মনকে মুক্তি দেবার, শক্তিকে খাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানিনে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাৎ। আমরা মানুষের জন্য যা দান করি তা এক দিকে খরচ হয়ে অন্যদিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখ্‌তে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলি নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না; তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে—নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কেবলি তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চল্‌তে হয়—কোথাও থাম্‌তে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এই জন্য যাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের

জন্যে নিজের শক্তিকে যাঁদের খাটানো আবশ্যক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্ব্বতে নির্জ্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান—শক্তির নিরন্তর অজস্র অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জ্জনতা এই পর্ব্বতগুহা কোথায় খুঁজে বেড়াব?—সে ত সব সময় জোটে না।—এবং মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও ত মানুষের ধর্ম্ম নয়।

এই নির্জ্জনতা এই পর্ব্বতগুহা এই সমুদ্র-তীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে—আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকৃত তাহলে নির্জ্জনতায় পর্ব্বতগুহায় সমুদ্রতীরে তাকে পেতুম না।

সেই অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই সেই জন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে।

অর্থাৎ, আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্চি—বাইরের সংস্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়, কারণ, মানুষকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ প্রতিকার হচ্চে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাহলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্ম্মলুব্ধ লোককে দেখ্‌তে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উদ্যমকে কেবলি মানদণ্ড হাতে করে হিসাবী কৃপণের মত খর্ব্ব করচে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে কেবলি শুষ্ক কৃশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করচে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না—আর যাই হোক্ মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে—উদ্দাম-ভাবে বেহিসাবী হলেও চল্‌বেনা, কৃপণভাবে হিসাবী হলেও চল্‌বে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্চে, বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের এক-মাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারম্বার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুল্‌তে হবে যে যখন-তখন ঘোর-তর কাজকর্ম্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেই-খানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্ব্বদা

ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ ত কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্চেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখ্‌তে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে, সর্ব্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করচেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করচেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জ্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস কর— শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড় ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই জান; যখন হাস্‌চ খেলচ কাজ করচ তখনো একবার সেখানে যেতে যেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাৎ হয়ে

উল্‌টে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়োনা। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাক্‌লে তবেই সংসার আর সঙ্কটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠ্‌তে পারবে না—বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠ্‌বে না।

"ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে,
অন্য কথা ছাড় না।
সংসার সঙ্কটে ত্রাণ নাহি কোনমতে
বিনা তাঁর সাধনা।"

৩রা ফাল্গুন

তীর্থ

আজ আবার বলছি—"ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে!" এই কথা যে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে আমাদের চির আশ্রয় আছেন এ কথা বলার প্রয়োজন কবে শেষ হবে?

কথা পুরাতন হয়ে ম্লান হয়ে আসে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে তখন তাকে আমরা অনাবশ্যক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূর হয় কই?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের সুপরিচিত, এই জন্যে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। আমাদের অন্তরে যে অনন্ত জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে

ফিরচে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। যদি তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হত তাহলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠ্‌ত না; তাহলে বাহিরে একটা ক্ষতি হবামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি বলে মনে করতে পারতুম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অনুগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থির করতুম না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টি পাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কি বল্‌বে, লোকে কি করবে সেই অনুসারেই আমাদের ভালমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি—এই জন্য লোকের কথা আমাদের মর্ম্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে,—লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এই জন্যে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে

আমার আর কেউ নেই—তখন আমরা এ কথা বলবার ভরসা পাইনে—যে

"সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে !"

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করেনি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মত আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করচে না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি; আমাদের নানা শক্তিকে নানাদিকে কেড়েকুড়ে নিচ্চে—কত

অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্চে তার ঠিকানা নেই ;—যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম্ম বিদ্ধ করচে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখ্‌চে ; সুখসমৃদ্ধির জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্চি ; একবার খবরও রাখিনে যে অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই ত সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অন্য লোককে বাইরে থেকে বিচার করচি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারচিনে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলি সঙ্কীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্চে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঙ্গলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বল্‌তে হবে—"ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে।" নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই

সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখ্‌তে পাব না এবং অন্যের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবেনা। যখন জান্‌ব যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখ্‌তে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন—তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে,তখন সংযম কেবল বাহিরের নিয়ম পালন-মাত্র হবে না। যে পর্য্যন্ত তা না হয়, যে পর্য্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ত, যে পর্য্যন্ত বাহিরই সমস্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবকাশ রোধ করে ফেলে—সে পর্য্যন্ত কেবলি বল্‌তে হবে—

“ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে
অন্য কথা ছাড়না!

সংসার সঙ্কটে ত্রাণ নাহি কোনো মতে
বিনা তাঁর সাধনা।"

কেন না, সংসারকে একমাত্র জান্‌লেই সংসার সঙ্কটময় হয়ে ওঠে—তখনি সে অরাজ অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্ব্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এস, অন্তরে এস! সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হোক্, কোনো আঘাত না পৌঁছক্, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক্—সেখানে ক্রোধকে পালন কোরোনা, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়োনা, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে রেখোনা—কেননা সেই খানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেব মন্দির; সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবেনা—সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্য স্থানের ফটক বন্ধ! এস সেই অক্ষুব্ধ নির্ম্মল অন্তরের মধ্যে এস—সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এস, সেই অত্যুচ্চের গিরি-

শিখরে এস—সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও, সেখানে নত হয়ে নমস্কার কর—সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃঙ্গের নিত্যবহমান নির্ঝরধারা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও, সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।

৪ঠা ফাল্গুন

বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন সুবিহিত সুশৃঙ্খল সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভাল রকম না হলে ঐক্যটিও ভাল রকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে তখন তার মধ্যে একের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হয় না।

আমাদের মধ্যে খুব একটি বড় বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্চে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ—যতদিন সেই বিভাগটি বেশ সুনির্দ্দিষ্ট না হবে ততদিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্য্যে সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটি মাত্র মহল; স্বার্থপরমার্থ নিত্য অনিত্য সমস্তই আমাদের ঐ এক জায়গায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই—সেই জন্যে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

যে জিনিষটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখ্‌তে হবে তাকে অন্তরে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লে সেখানে সেটা জঞ্জাল হয়ে ওঠে। যেখানে যার স্থান নয় সেখানে সে যে অনাবশ্যক তা নয় সেখানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই বাহিরের জিনিষ যাতে বাহিরেই থাক্‌তে পারে ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকেনা। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না,

তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন ?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্‌গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে,—কিন্তু সে ত বাইরেই ঝরে পড়ে যায় ; সেই তার বাহিরের অনিবার্য্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে ত পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহত ভাবে চল্‌তে থাকে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করিনে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাখরচ ভিতরের খাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামী বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপ-কল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখ্‌তে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহালে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম্ম আছে—সেখানে জমা করবার

জায়গা। এই জন্যে সেখানে এমন কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিষ নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃত দেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে, জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে এই দুইটি কক্ষ আছে, স্থায়িত্বের এবং অস্থায়িত্বের—অন্তরের এবং সংসারের।

অন্য জন্তুদের মধ্যেও সেটা অস্ফুটভাবে আছে—তেমন গভীরভাবে নেই। সেই জন্যে অন্য জন্তুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না, কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মানুষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা

প্রয়োগ করে তাকে যতদিন পারে টিঁকিয়ে রাখ্‌তে ত্রুটি করে না। তার অন্তর প্রকৃতি না কি স্থায়িত্বের নিকেতন এই জন্যেই তার এই সুবিধাটা ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্তুদের মধ্যে যে সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অনুগত হয়ে আপন স্বাভাবিক কর্ম্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায় মানুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিয়ে কল্পনার রসে ডুবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে—প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এই জন্যে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে জিনিষটা অন্ন-সংগ্রহ-চেষ্টারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত কর তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্ত্তি ধারণ করে স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখ্‌তে পাচ্চি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্য-নিকেতনে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্যে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্চে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের খাদ্য নয়। যে দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাহু এবং ল্যাজটা কেতু আকারে বৃথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গলরূপে সমস্ত জগৎকে দুঃখ দিচ্চে।

আমাদের যে অন্তর ভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার

দিই তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সঙ্গতি নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই দুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে কিন্তু বাহিরে কর্ম্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট—সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্ব্বত বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে—তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভুর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত ত দাসের বেতন নয়—সে যে দেবতার পূজার ভোগ সামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিয়ে

গিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌লেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বল্‌ছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনযাত্রার সাধনা।

৫ই ফাল্গুন ১৩১৫

দ্রষ্টা

অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখোনা। সমস্ত-টাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার কোন রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘোরতর কর্ম্ম-সংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব কোরো। এই রকম ক্ষণে ক্ষণে বার-বার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মত দেখে নিতে হবে, সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পৌঁছচ্ছে না। সেখানে শান্ত স্তব্ধ নির্ম্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না।

এই যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসি-খেলার মহাজনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘুরে এস—দেখে এসো সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বল্‌ছে, অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছয় না, ক্রোধের গর্জ্জন সেখানে শান্ত।

এই বিশ্ব সংসারে এমন কিছুই নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নয়। এই জগৎ তাঁরই বটে তিনি এর সর্ব্বত্রই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জান্‌বে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর;—এই সংসারে, শরীরে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার,

শরীর, বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে' বিশেষ নাম ধরে' নানা সুখ দুঃখ ভোগ করচে এই তাঁর ·বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্চেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি—তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ দুঃখের অতীত হয়ে যাই—নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা *শূন্য* নয়, তখন নিজের অন্তরে সেই নির্ম্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং।" নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় পরম কোষকে জান্‌তে

পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

এইজন্যই উপনিষৎ বারম্বার বলেছেন, "অন্তরাত্মাকে জান তাহলেই অমৃতকে জানবে, তাহলেই পরমকে জানবে—তাহলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছুই পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

৬ই ফাল্গুন

নিত্যধাম

উপনিষৎ বলেছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোন্‌খানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখ—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত—সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখ—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে একমুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ কর—সেইখানে তাকাও—তাহলেই ব্রহ্মের আনন্দ

যে কি, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে—এবং তাহলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাক্‌বে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধি-ব্যাধি জরা মৃত্যু বিচ্ছেদ মিলন, যেখানে আনা-গোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলি যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ—যদি তাকে কেবলি কার্য্য থেকে কার্য্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান তাহলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলি শোক করতে থাক্‌বে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাক্‌বে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয়

হচ্চে বিনাশ হচ্চে—এমনি করে বারম্বার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড় পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে দেখ—তা হলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে—তা হলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী! আত্মা ক্ষণিক সংসারের :দাসানুদাস নয়—আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত—আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত—সেই জন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা "ন বিভেতি কদাচন।"

"পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।"

পরমব্রহ্মের মধ্যে যাঁরা আপনাকে মুক্ত

করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন। আর সংসারে যাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা "শোচতি শোচতি শোচত্যেব।"

৭ই ফাল্গুন ১৩১৫

পরিণয়

চারিদিকে সংসারে আমরা দেখচি—সৃষ্টি-ব্যাপার চল্‌চেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্চে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্চে—আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে—এক মুহূর্ত্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিষই পরিণতির পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিষেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর বুদ্ধি মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরচে—ক্রমাগতই তার সংযোগ বিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই সূর্য্যতারাময় লক্ষকোটি চাকার রথ ধাবিত হচ্চে—কোথাও এর শেষ গম্যস্থান দেখিনে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি—যেন এক জায়-

গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্চে অথচ কোনোকালে কোথাও পৌঁছতে পারচিনে? আমাদের অস্তিত্বই কি এই রকম অবিশ্রাম চলা, এই রকম অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো অর্থই নেই।

তা যদি হয় তবে এই ব্রহ্মের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। যাঁকে কোনো

কালেই পাবনা তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মত বিড়ম্বনা আর কি আছে ? তাহলে এই কথাই বল্‌তে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকেও ত পাওয়া যায় না। সংসার ত মায়ামৃগের মত আমাদের কেবলি এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা ত দেয় না। কেবলি খাটিয়ে মারে ছুটি দেয় না— ছুটি যদি দেয় ত একেবারে বরখাস্ত করে ;— এমন কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। শ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ—অর্থাৎ সে কেবলি আমাদের চালাবে—খাওয়াবে সেও চালাবার জন্যে— মাঝে মাঝে যেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্যে—চাবুক লাগাম সমস্তই চালাবার উপকরণ—যখন না চল্‌ব তখন খাওয়াবেও না, আস্তাবলেও রাখ্‌বে না, ভাগাড়ে ফেলে

দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না—ঘোড়া স্পষ্ট করে জানেও না সে ফল কে পাচ্চে—ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চল্‌তেই হবে; সে মূঢ়ের মত কেবলি নিজেকে প্রশ্ন করচে, কোনো কিছুই পাচ্চিনে, কোথাও গিয়ে পৌঁছচ্চিনে তবু দিনরাত কেবলি চল্‌চি কেন? পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষুধার চাবুক পড়চে, হৃদয় মনের মধ্যে কত শত জ্বালাময় ক্ষুধার চাবুক পড়চে কোথাও স্থির থাক্‌তে দিচ্চে না—এর অর্থ কি?

যাই হোক্‌ কথা হচ্চে এই যে, সংসারকে ত কোনো খানেই পাচ্চিনে—তার কোনোখানে এসেই থামচিনে—ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মত? তাঁকেও কি কোনো খানেই পাওয়া যাবে না? তিনিও কি আমাদের অনন্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনন্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলি কোনোমতে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করব?

তা নয়। ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই—সংসারের তত্ত্বই হচ্চে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে একথা বলা কোনোমতেই চল্‌বে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা তিনিই হচ্চেন সত্য।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করচি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্চি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলচি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করচি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলেনা

—তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশকালের রাজত্ব নয়—সেখানে ক্রমশঃ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বল্‌চেন—

"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেই খানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীর ভাবে অবস্থিত জানেন তাঁহার সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন একথা বলবার কোনো মানে নেই; তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং

জ্ঞানমনন্তংরূপে সুগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন এইটি ঠিকমত জান্‌লে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এই জন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাইনে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই কেন না তিনি এ'কে স্বয়ং বরণ করেছেন; কোন্‌ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে! বলা হয়ে গেছে "যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব!" এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্ত" "এষ!" হয়ে আছেন; তিনি এর এই হয়ে বসেছেন—নাম করবার জো নেই। তাই

ত ঋষি কবি বলেন—"এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ!"

পরিণয় ত সমাপ্তই হয়ে গেছে—সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানা রকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভাল করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই; সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যে, যিনি সত্যং-জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মত গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি—সংসারে তাঁরই প্রেমের লীলা। এই খানেই নিত্যের সঙ্গে

অনিত্যের চিরযোগ—আনন্দের অমৃতের যোগ। এই খানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানা রকমে পাচ্চি ;—যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্চি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্চি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই "আনন্দংব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখেনি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে, যেখানে তার রাণীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে—ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

দৌর্ভিক্ষ্যাৎ যাতি দৌর্ভিক্ষ্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং
ভয়াৎভয়ং।

৯ই ফাল্গুন ১৩১৫